একক ৪৬ ☐ পঞ্চতন্ত্র ঃ বই কেনা — সৈয়দ মুজতবা আলী

গঠন

৪৬.১ উদ্দেশ্য
৪৬.২ প্রস্তাবনা
৪৬.৩ লেখক-পরিচিতি ঃ প্রাবন্ধিক সৈয়দ মুজতবা আলী
৪৬.৪ মূলপাঠ — বই কেনা — বিশ্লেষণী পাঠ
৪৬.৫ সারাংশ
৪৬.৬ অনুশীলনী
৪৬.৭ গ্রন্থপঞ্জি

৪৬.১ উদ্দেশ্য

- সৈয়দ মুজতবা আলীর বিশিষ্ট গদ্যশৈলী সম্পর্কে পাঠক অবহিত হবেন।
- তাঁর জ্ঞানের বিশাল পরিধি সম্বন্ধে পাঠকের একটি স্বচ্ছ ধারণা গড়ে উঠবে।
- পাঠক সর্বোপরি এই প্রবন্ধ পাঠ করে আরো বেশি বই কেনায় ও বই পড়ায় আগ্রহী হবেন।
- যে বিশিষ্টজনদের কথা লেখক এখানে উল্লেখ করেছেন, তাঁদের সম্পর্কে কৌতূহলী পাঠক আরো বিশদ জানতে আগ্রহী হবেন।

৪৬.২ প্রস্তাবনা

এই এককটিতে সৈয়দ মুজতবা আলী সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে। এককের মূলপাঠে মুজতবা আলীর "পঞ্চতন্ত্র" গ্রন্থের "বইকেনা" প্রবন্ধটি সম্পর্কে বিশ্লেষণমূলক আলোচনা করা হয়েছে। মুজতবা আলীর রচনাশৈলীর কতকগুলি বৈশিষ্ট্য সম্পর্কেও এখানে উল্লেখ করা আছে। "বাজে কথা" প্রবন্ধটি যে সাধারণ বাঙালিকে বই কেনা ও পড়ার জন্য উৎসাহিত করতে লেখা হয়েছে, সে কথাও এককের মধ্যে পাওয়া যাবে।

আপনি এককটি ভালো করে পাঠ করুন এবং অনুশীলনীগুলির সমস্ত উত্তর করুন। বিষয়বস্তু সহজ করে আলোচনা করা হয়েছে, তাই বুঝতে আপনার অসুবিধা হবে না।

৪৬.৩ লেখক পরিচিতি ঃ প্রাবন্ধিক সৈয়দ মুজতবা আলী

১৩ই সেপ্টেম্বর ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে শ্রীহট্ট জেলার করিমগঞ্জে জন্ম। পিতা সৈয়দ সিকান্দর আলী ছিলেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও ভাষাবিদ। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে গান্ধীজির ডাকে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে স্কুল ছেড়ে দেন। ১৯২১-২৬ পর্যন্ত শান্তিনিকেতনে অধ্যয়ন করেন। শিক্ষা শেষে তিনি কাবুলের শিক্ষাবিভাগের ফরাসী ও ইংরাজী ভাষার অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৯২৮-৩০ জার্মানি থেকে বৃত্তি পেয়ে বার্লিন ও বন বিশ্ববিদ্যালয়ে পি.এইচ.ডি উপাধি লাভ করেন। তারপর সমস্ত ইউরোপ এবং জেরুসালেম দামাস্কাস প্রভৃতি দেশে ঘুরে এক বছর কায়রোতে অধ্যয়ন করেন। ১৯৩৬-এ তিনি বরোদা রাজ্যে তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের অধ্যাপক পদে বৃত হন। ভারত বিভাগের পর বগুড়া কলেজে অধ্যক্ষতা করেন। ১৯৫০-এ আকাশবাণীর কেন্দ্রপরিচালক হন। বিশ্বভারতীর ইসলামী সংস্কৃতির প্রধান অধ্যাপকও ছিলেন। তিনি আরবি, ফারসি, হিন্দী, সংস্কৃত, উর্দু, মারাঠী গুজরাটী, ইতালিয়ান, ফরাসি, জার্মান সহ ১৫টি ভাষা জানতেন। প্রবন্ধ, ভ্রমণকাহিনী, উপন্যাস ও রম্যরচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলি হল—দেশেবিদেশে, পঞ্চতন্ত্র, চাচাকাহিনী, ময়ূরকণ্ঠী, শবনম, ধূপছায়া টুনিমেম প্রভৃতি। ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি নরসিংহ দাস পুরস্কার পান। ১১ই ফ্রেব্রুয়ারি ১৯৭৪-এ তাঁর মৃত্যু হয়।

উনিশ শতক থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত যাঁদের লেখনী বাংলা রসসাহিত্যের ধারাটিকে পুষ্ট করেথেছ, আলী সাহেব তাঁদের অন্যতম। মূলত তিনি রস-সাহিত্যের বা রম্যরচনার লেখক হলেও অন্যান্য লেখকদের সঙ্গে তাঁর পার্থক্য অনেক। তাঁর রচনায় যেমন হাসির খোরাক আছে, তেমনি আছে উপাদেয় ভ্রমণকাহিনী ; গভীর রোমান্টিক ও মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস যেমন তাঁর লেখনী থেকে বেরিয়েছে, তেমনি বেরিয়েছে ভয়াল রোমাঞ্চকর আধা গোয়েন্দাকাহিনী, রাজনীতির নানা লোমহর্ষক ঘটনার বিশ্লেষণ ; কাব্যসুষমামণ্ডিত প্রকৃতি বর্ণনা যেমন পাওয়া গেছে তাঁর কাছ থেকে, তেমনি পাওয়া গেছে, ভাষা-ধর্ম-শিক্ষা নিয়ে মূল্যবান চিন্তাপূর্ণ আলোচনা। একই লেখকের এমন বহুমুখী রচনার নির্দশন সাহিত্যে খুবই দুর্লভ। তাই তাঁর রচনা প্রচুর জনসমাদর পেয়েছে।

রম্যরচনার ক্ষেত্রে নতুন প্রকাশভঙ্গিতে যে লেখক প্রথম জনপ্রিয়তা অর্জন করেন তিনি যাযাবর। তাঁর অনবদ্য সুন্দর প্রথম গ্রন্থ 'দৃষ্টিপাত' বিস্ময়ের দৃষ্টি নিয়ে বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশ করে। এরফরেই মুজতবা আলী এই ক্ষেত্রে সুনাম অর্জন করেছেন। তাঁর রচনাশৈলীর একটি স্বকীয় বৈশিষ্ট্য আছে। তিনি তাঁর মনের ভাব বাচনভঙ্গির উপর এঁকে দিতে সমর্থ ছিলেন। তিনি অনেক আর্‌বি ফার্‌সি শব্দ ও পূর্ববঙ্গের আঞ্চলিক শব্দকে বাংলাভাষায় প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তাঁর কলমের গুণে তাঁর ব্যবহৃত নতুন শব্দ আঞ্চলিকতাকে অতিক্রম করে গিয়েছিল। তাঁর গদ্যে ফরাসি ভাষার প্রাঞ্জলতা, স্বচ্ছতা, সরসতা ও বুদ্ধিদীপ্ত তীক্ষ্ণতা লক্ষ্য করা যায়। লঘু চালের ভাষায় বুদ্ধিদীপ্ত রচনাশৈলীতে চমক ও শ্লেষের ব্যবহারে তিনি এক অভিনব রম্য সাহিত্য সৃষ্টি করেছিলেন। অতি সাধারণ ঘটনাকেও তিনি তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ শক্তি ও অসাধারণ কল্পনাশক্তির আতস কাঁচের ভিতর দিয়ে এক তীব্রতর স্বচ্ছ রূপ প্রদান করতেন। আর এখানেই তাঁর সাহিত্যিক অনন্যতা নিহিত।

৪৬.৪ মূলপাঠ — বই কেনা ঃ বিশ্লেষণী পাঠ

বই কেনা

মাছি-মারা-কেরানী নিয়ে যত ঠাট্টা-রসিকতাই করি না কেন, মাছি ধরা যে কত শক্ত সে কথা পর্যবেক্ষণশীল ব্যক্তিমাত্রই স্বীকার করে নিয়েছেন। মাছিকে যেদিন দিয়েই ধরতে যান না কেন, সে ঠিক সময়ে উড়ে যাবেই। কারণ অনুসন্দান করে দেখা গিয়েছে, দু'টো চোখ নিয়েই মাছির কারবার নয়, তার সমস্ত মাথা জুড়ে নাকি গাদা চোখ বসানো আছে। আমরা দেতে পাই শুধু সামনের দিক, কিন্তু মাছির মাথার চতুর্দিকে চক্রাকারে চোখ বসানো আছে বলে সে একই সময়ে সমস্ত পৃথিবীটা দেখতে পায়।

তাই নিয়ে গুণী ও জ্ঞানী আনাতোল ফ্রাঁস দুঃখ করে বলেছেন, 'হায়, আমার মাথার চতুর্দিকে যদি চোখ বসানো থাকতো তাহলে আচক্রবালবিস্তৃত এই সুন্দরী ধরণীর সম্পূর্ণ সৌন্দর্য একসঙ্গেই দেখতে পেতুম।'

কথাটা যে খাঁটি সে কথা চোখ বন্ধ করে একটুখানি ভেবে নিলেই বোঝা যায়। এবং বুঝে নিয়ে তখন এক আপসোস ছাড়া অন্য কিছু করবার থাকে না। কিন্তু এইখানেই ফ্রাঁসের সঙ্গে সাধারণ লোকের তফাৎ। ফ্রাঁস সান্ত্বনা দিয়ে বলেছেন, 'কিন্তু আমার মনের চোখ তো মাত্র একটি কিংবা দুটি নয়। মনের চোখ বাড়ানো কমানো তো সম্পূর্ণ আমার হাতে। নানা জ্ঞানবিজ্ঞান যতই আমি আয়ত্ব করতে থাকি, ততই এক একটা করে আমার মনের চোখ ফুটতে থাকে।'

পৃথিবীর আর সব সভ্য জাত যতই চোখের সংখ্যা বাড়াতে ব্যস্ত, আমরা ততই আরব্য-উপন্যাসের এ চোখা দৈত্যের মত ঘোঁৎ ঘোঁৎ করি আর চোখ বাড়াবার কথা তুললেই চোখ রাঙাই।

চোখ বাড়াবার পন্থাটা কি ? প্রথমতঃ—বই পড়া, এবং তার জন্য দরকার বই কেনার প্রবৃত্তি।

মনের চোখ ফোটানোর আরো একটা প্রয়োজন আছে। বারট্রাণ্ড রাসেল বলেছেন, "সংসারের জ্বালা-যন্ত্রণা এড়াবার প্রধান উপায় হচ্ছে, মনের ভিতর আপন ভুবন সৃষ্টি করে নেওয়া এবং বিপদকালে তার ভিতর ডুব দেওয়া। যে যত বেশি ভুবন সৃষ্টি করতে পারে, যন্ত্রণা এড়াবার ক্ষমতা তার ততই বেশী হয়।"

অর্থাৎ সাহিত্যে সান্ত্বনা না পেলে দর্শন, দর্শন কুলিয়ে উঠতে না পারলে ইতিহাস, ইতিহাস হার মানলে ভুগোল—আরো কত কি।

কিন্তু প্রশ্ন, এই অসংখ্য ভুবন সৃষ্টি করি কি প্রকারে ?

বই পড়ে। দেশ ভ্রমণ করে। কিন্তু দেশ ভ্রমণ করার মত সামর্থ্য এবং স্বাস্থ্য সকলের থাকে না, কাজেই শেষ পর্যন্ত বাকি থাকে বই। তাই ভেবে হয়ত ওমর খৈয়াম বলেছিলেন—

Here with a loaf of bread
beneth the bough
A flask of wine, A book of
verse and thou,
Beside me singing in the wilderness
And wilderness if paradise enow.

রুটি মদ ফুরিয়ে যাবে, প্রিয়ার কালো চোখ ঘোলাটে হয়ে আসবে, কিন্তু বইখানা অনন্ত-যৌবনা—যদি তেমন বই হয়। তাই বোধ করি খৈয়াম তাঁর বেহেশ্‌তের সরঞ্জামের ফিরিস্ত বানাতে গিয়ে কেতাবের কথা ভোলেন নি।

আর খৈয়াম তো ছিলেন মুসলমান। মুসলমানদের পয়লা কেতাব কোরানের সর্বপ্রথম যে বাণী মুহম্মদ সাহেব শুনতে পেয়েছিলেন, তাতে আছে "আল্লামা বিল কলমি" অর্থাৎ আল্লা মানুষকে জ্ঞান দান করেছেন 'কলমের মাধ্যমে'। আর কলমের আশ্রয় তো পুস্তকে।

বাইবেল শব্দের অর্থ বই—বই Per excellence, সর্বশ্রেষ্ঠ পুস্তক — The Book.

যে-দেবকে সর্ব মঙ্গালকর্মের প্রারম্ভে বিঘ্নহন্তারূপে স্মরণ করতে হয়, তিনি তো আমাদের বিরাটতম গ্রন্থ স্বহস্তে লেখার গুরুভাবে আপন স্কন্ধে তুলে নিয়েছিলেন। গণপতি 'গণ' অর্থাৎ জনসাধারণের দেবতা। জনগণ যদি পুস্তকের সম্মান করতে না শেখে তবে তারা দেবভ্রষ্ট হবে।

কিন্তু বাঙালী নাগর ধর্মের কাহিনী শোনে না। তার মুখে ঐ এক কথা 'অত কাঁচা পয়হা কোথায়, বাওয়া, যে বই কিনব ?'

কথাটার মধ্যে একটুখানি সত্য—কনিষ্ঠাপরিমাণ—লুকানো রয়েছে। সেইটুকুই এই যে, বই কিনতে পয়সা লাগে—ব্যস্। এর বেশী আর কিছু নিয়।

বইয়ের দাম যদি আরো কমানো যায়, তবে আরো অনেক বেশী বই বিক্রি হবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তাই যদি প্রকাশককে বলা হয়, 'বইয়ের দাম কমাও,' তবে সে বলে 'বই যথেষ্ট পরিমাণে বিক্রি না হলে বইয়ের দাম কমাবো কি করে ?'

'কেন মশাই, সংখ্যার দিক দিয়ে দেখতে গেলে বাঙলা পৃথিবীর ছয় অথবা সাত নম্বরের ভাষা। এই ধরুন ফরাসী ভাষা। এ ভাষার বাঙলার তুলনায় ঢের কম লোক কথা কয়। অথচ যুদ্ধের পূর্বে বারো আনা, চৌদ্দ আনা, জোর পাঁচ 'সিকে দিয়ে যেকোন ভাল বই কেনা যেত। আপনারা পারেন না কেন ?'

'আজ্ঞে, ফরাসী প্রকাশক নির্ভয়ে যে-কোন ভালো বই এক ঝটকায় বিশ হাজার ছাপাতে পারে। আমাদের নাভিশ্বাস ওঠে দু'হাজার ছাপাতে গেলেই। বেশী ছাপিয়ে দেউলে হব নাকি ?'

তাই এই অচ্ছেদ্য চক্র। বই সস্তা নয় বলে লোকে বই কেনে না, আর লোকে বই কেনে না বলে বই সস্তা করা যায় না।

এ চক্র ছিন্ন তো করতেই হবে। করবে কে ? প্রকাশক না ক্রেতা ? প্রকাশকের পক্ষে করা কঠিন, কারণ ঐ দিয়ে সে পেটের ভাত যোগাড় করে। সে ঝুঁকিটা নিতে নারাজ। একস্‌পেরিমেন্ট করতে নারাজ—দেউলে হওয়ার ভয়ে।

কিন্তু বই কিনে কেউ তো কখনো দেউলে হয়নি। বই কেনার বাজেট যদি আপনি তিনগুণও বাড়িয়ে দেন, তবু তো আপনার দেউলে হবার সম্ভাবনা নেই। মাঝখান থেকে আপনি ফ্রাঁসের মাছির মত অনেকগুলি চোখ পেয়ে যাবেন, রাসেলের মত এক গাদা নতুন ভুবন সৃষ্টি করে ফেলবেন।

ভেবে-চিন্তে অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা করে বই কেনে সংসারী লোক। পাঁড় পাঠক বই কেনে প্রথমটায় দাঁতমুখ খিচিয়ে, তারপর চেখে চেখে সুখ করে করে এবং সর্বশেষে সে সে কনে ক্ষ্যাপার মত, এবং চুর হয়ে থাকে তার মধ্যিখানে। এই একমাত্র বাসন, একমাত্র নেশা যার দরুন সকালবেলা চোখেল সামনে সারে সারে গোলাপী হাতী দেখতে হয় না, লিভার পচে পটল তুলতে হয় না।

আমি নিজে কি করি ? আমি একাধারে producer এবং consumer তামাকের মিকশ্চার দিয়ে আমি নিজেই সিগারেট বানিয়ে producer এবং সেইটে খেয়ে নিজেই consumer আরও বুঝিয়ে বলতে হবে ? আমি একখানা বই producer করেছি—কেউ কেনে না বলে আমিই consumer অর্থাৎ নিজেই মাঝে মাঝে কিনি।

* * *

মার্ক টুয়েনের লাইব্রেরিখানা নাকি দেখবার মত ছিল। মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত বই, বই শুধু বই। এমন কি কার্পেটের উপরও গাদা গাদা স্তূপীকৃত হয়ে পড়ে থাকত—পা ফেলা ভার। একবন্ধু তাই মার্ক টুয়েনকে বললেন, 'বইগুলো নষ্ট হচ্ছে ; গোটাকয়েক শেলফ যোগাড় করছ না কেন ?'

মার্ক টুয়েন খানিকক্ষণ মাথা নিচু ক'রে ঘাড় চলিকে বললেন, 'ভাই বলছো ঠিকই—কিন্তু লাইব্রেরিটা যে কায়দায় গড়ে তুলেছি, শেলফ তো আর সে কায়দায় যোগাড় করতে পারিনে। শেলফ তো আর বন্ধুবান্ধবের কাছ থেকে ধার চাওয়া যায় না।'

শুধু মার্ক টুয়েনই না, দুনিয়ার অধিকাংশ লোকই লাইব্রেরি গড়ে তোলে কিছু বই কিনে ; আর কিছু বই বন্ধুবান্ধবের কাছ থেকে ধার করে ফেরৎ না দিয়ে। যে মানুষ পরের জিনিস গলা কেটে ফেললেও ছোঁবে না সেই লোকই দেখা যায় বাইরের বেলা সর্বপ্রকার বিবেক-বিবর্জিত। তার কারণটি কি ?

এক আরব পণ্ডিতের লেখাতে সমস্যাটার সমাধান পেলুম।

পণ্ডিত লিখেছেন, 'ধনীরা বলে, পয়সা কামানো দুনিয়াতে সবচেয়ে কঠিন ধর্ম। কিন্তু জ্ঞানীরা বলেন না, জ্ঞানার্জন সবচেয়ে শক্ত কাজ। এখন প্রশ্ন, কার দাবিটা ঠিক, ধনীর না জ্ঞানীর ? আইম নিজের জ্ঞানের সন্ধানে ফিরি, কাজেই আমার পক্ষে নিরপেক্ষ হওয়া কঠিন। তবে একটা জিনিস আমি লক্ষ্য করেছি, সেইটে আমি বিচক্ষণ জনের চক্ষুগোচর করাতে চাই। ধনীর মেহন্নতের ফল হল টাকা। সে ফল যদি কেউ জ্ঞানীর হাতে তুলে দেয়, তবে তিনি সেটা পরমানন্দে কাজে লাগান, এবং শুধু তাই নয়, অধিকাংশ সময়েই দেখা যায়, জ্ঞানীরা পয়সা পেলে খরচ করতে পারেন ধনীদের চেয়ে অনেক ভালো পথে যের উত্তম পদ্ধতিতে। পক্ষান্তরে জ্ঞানচর্চার ফল সঞ্চিত থাকে পুস্তকরাজিতে এবং সে ফল ধনীদের হাতে গায়ে পড়ে তুলে ধরলেও তারা তার ব্যবহার করতে জানে না—বই পড়তে পারে না।

আরব পণ্ডিত তাই বক্তব্য শেষ করেছেন কিউ. ই. ডি নিয়ে 'অতএব সপ্রমাণ হল জ্ঞানার্জন ধনার্জনের চেয়ে মহত্তর।

তাই প্রকৃত মানুষ জ্ঞানের বাহন পুস্তক যোগাড় করার জন্য অকাতরে অর্থব্যয় করে। একমাত্র বাঙলা দেশ ছাড়া।

সেদিন তাই নিয়ে শোকপ্রকাশ করাতে আমার জনৈক বন্ধু একটি গল্প বললেন। এক ড্রইংরুম-বিহারিণী গিয়েছেন বাজারে স্বামীর জন্মদিনের জন্য সওগাত কিনতে। দোকানদার এটা দেখায়, সেটা শোঁকায়, এটা নাড়ে, সেটা কাড়ে, কিন্তু গরবিনী ধনীর (উভয়ার্থে) কিছুই আর মনঃপুত হয় না। সব কিছুই তাঁর স্বামীর ভাণ্ডারে রয়েছে। শেষটায় দোকানদার নিরাশ হয়ে বললেন 'তবে একখানা ভাল বই দিলে হয় না ?' গরবিনী নাসিকা কুঞ্চিত করে বললেন, 'সেও তো ওঁর একখানা রয়েছে।'

যেমন স্ত্রী তেমনি স্বামী। একখানা বই-ই তাদের পক্ষে যথেষ্ট।

অথচ এই বই জিনিসটার প্রকৃত সম্মান করতে জানে ফ্রান্স। কাউকে মোক্ষম মারাত্মক অপমান করতে হলেও তারা ঐ জিনিস দিয়েই করে। মনে করুন আপনার সবচেয়ে ভক্তি-ভালোবাস দেশের জন্য। তাই যদি কেউ আপনাকে ডাহা বেইজ্জং করতে চায় ; তবে সে অপমার করবে আপনার দেশকে। নিজের অপমান আইন হয়ত মনে মনে পঞ্চাশ গুণে নিয়ে সয়ে যাবেন, কিন্তু দেশের অপমান অপনাকে দংশন করবে বহুদিন ধরে।

আঁদে জিদে'র মেলা বন্ধুবান্ধব ছিলেন—অধিকাংশই নামকরা লেখক। জিদ রুসিয়া থেকে ফিরে এসে সোভিয়েট রাজ্যের বিরুদ্ধে একখানা প্রাণঘাতী কেতাব ছাড়েন। প্যারিসের স্তালিনীয়ারা তখন লাগল জিদের পিছনে—গালিগালাজ টুকাটব্য করে জিদের প্রাণ অতিষ্ঠ করে তুললো। কিন্তু আশ্চর্য, জিদের লেখক বন্ধুদের অধিকাংশই চুপ ক'রে সব কিছু শুনে গেলেন, জিদের হয়ে লড়লেন না। জিদের জিগরে জোর চোট লাগল—তিনি স্থির করলেন, এদের একটা শিক্ষা দিতে হবে।

কাগজে বিজ্ঞাপন বেরল। জিদ তাঁর লাইব্রেরিখানা নিলামে বেচে দেবেন বলে মনস্থির করেছেন। প্যারিস খবর শুনে প্রথমটায় মূর্ছা গেল, কিন্তু সম্বিতে ফেরা মাত্রই মুক্তকচ্ছ হয়ে ছুটলো নিলাম-খানার দিকে।

সেখানে গিয়ে অবস্থা দেখে সকলেরই চক্ষুস্থির।

যে-সব লেখক জিদের হয়ে লড়েন নি, তাঁদের যে-সব বই তাঁরা জিদকে স্বাক্ষর সহ উপহার দিয়েছিলেন, জিদ মাত্র সেগুলোই নিলামে চড়িয়েছেন। জিদ শুধু জঞ্জালই বেচে ফেলছেন।

প্যারিসের লোক তখন যে অট্টহাস্য ছেড়েছিল, সেটা আমি ভূমধ্যসাগরের মধ্যিখানে জাহাজে বসে শুনতে পেয়েছিলাম—কারণ খবরটার গুরুত্ব বিবেচনা করে রয়টার সেটা বেতারে ছড়িয়েছিলেন—জাহাজের টাইপ-করা একশো লাইনি দৈনিক কাগজ সেটা সাড়ম্বরে প্রকাশ করেছিল।

অপমানিত লেখকরা ডবল তিন ডবল দামে আপন আপন বই লোক পাঠিয়ে তড়িঘড়ি কিনিয়ে নিয়েচিলেন—যত কম লোকে কেনা কাটার খবরটা জানতে পারে ততই মঙ্গল। (বাঙলা দেশে নাকি একবার এরকম টিকি বিক্রি হয়েছিল।)

* * *

আর কত বলবো ? বাঙালীর কি চেতনা হবে ?

তাও বুঝতুম, যদি বাঙালীর জ্ঞানতৃষ্ণা না থাকতো। আমার বেদনাটা সেইখানে। বাঙালী যদি হটেনটট হত, তবে কোনো দুঃখ ছিল না। এরকম অদ্ভুত সংমিশ্রণ আমি ভূ-ভারতের কোথাও দেখি নি। জ্ঞানতৃষ্ণা তার প্রবল, কিন্তু বই কেনার বেলা সে অবলা। আবার কোনো কোনো বেশরম বলে, 'বাঙালীর পয়সার অভাব।' বটে ? কোথায় দাঁড়িয়ে বলছে লোকটা এ-কথা ? ফুটবল মাঠের সামনে দাঁড়িয়ে বলছে লোকটা এ-কথা ? ফুটবল মাঠের সামনে দাঁড়িয়ে, না সিনেমার টিকিট কাটার 'কিউ' থেকে।

থাক্ থাক্। আমাকে খামাখা চটাবেন না। বৃষ্টির দিন। খুশ গল্প লিখব বলে কলম ধরেছিলুম। তাই দিয়ে লেখাটা শেষ করি। গল্পটা সকলেই জানেন, কিন্তু তার গূঢ়ার্থ মাত্র কাল বুঝতে পেরেছি। আরব্যোপন্যাসের গল্প।

এক রাজা তাঁর হেকিমের একখানা বই কিছুতেই বাগাতে না পেরে তাঁকে খুন করেন। বই হস্তগত হল। রাজ্য বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে বইখানা পড়ছেন। কিন্তু পাতায় পাতায় এমনি জুড়ে গিয়েছে যে, রাজা বার বার আঙুল দিয়ে মুখ থেকে থুথু নিয়ে জোড়া ছাড়িয়ে পাতা উল্টোচ্ছেন। এদিকে হেকিম আপন মৃত্যুর জন্য তৈরি ছিলেন বলে প্রতিশোধের ব্যবস্থাও করে গিয়েছিলেন। তিনি পাতায় পাতায় কোণের দিকে মাখিয়ে রেখেছিলেন মারাত্মক বিষ। রাজার আঙুল সেই বিষ মেখে নিয়ে যাচ্ছে মুখে।

রাজাকে এই প্রতিহিংসার খবরটিও হেকিম রেখে গিয়েছিলেন কেতাবের শেষ পাতায়। সেইটে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে রাজা বিষবাণের ঘায়ে ঢলে পড়লেন।

বাঙালীর বই কেনার প্রতি বৈরাগ্য দেখে মনে হয়, সে যেন গল্পটা জানে, আর মরার ভয়ে বই কেনা, বই পড়া চেড়ে দিয়েছে।

বিশ্লেষণী পাঠ ঃ

সাধারণ বাঙালীকে বই পড়া ও তার জন্য বই কেনায় প্রবৃত্ত করানাই এই প্রবন্ধে প্রবন্ধকারের মূল উদ্দেশ্য। কিন্তু মূল বিষয়ে যাবার আগে তিনি স্বভাবসজ্ঞাত ভাবে হালকা একটি প্রসঙ্গ নিয়ে সরলভাবে নিবন্ধটি শুরু করেছেন। তাই মাছি-মারা কেরানীর সূত্রে তিনি মাছি ধরার আপাত কঠিন কাজিটির কথা বলেছেন। মশার মতো মাছি সহজে মারা যায় না, কারণ তাদের সম্বল কেবল দুটে চোখ নয়, তাদের সমস্ত মাথা জুড়েই নাকি অজস্র চোখ আছে। তাই ধরার আগেই মাঠি ঠিক উড়ে যায়। মাছিদের এই চোখ সমৃদ্ধতা নিয়ে আনাতেলে ফ্রাঁস আক্ষেপ করেছিলেন। কারণ যদি তাঁর মাথার চতুর্দিকে চোখ থাকতো তবে তিনি এই সুন্দরী ধরণীর অপূর্ব সৌন্দর্যকে আরো বেশি করে একসঙ্গে দেখতে পেতেন। তবে ফ্রাঁস এই ভেবে সান্ত্বনা পেয়েছিলেন যে, মানুষের চক্ষু-ইন্দ্রিয় দুটি থাকলে কি হবে, সে মনের চোখের সংখ্যা সর্বদা বাড়াতে পারে। আর এটা করা সম্ভব জ্ঞানের পিপাসা বাড়িয়ে। চোখ বাড়াবার পন্থ স্বরূপ তাই আলী সাহে বই পড়া ও বই কেনার কথা বলেছেন। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে তিনি লক্ষ্য করেছেন—পৃথিবীর আর সব সভ্যজাতি যেখানে বহুপাঠের মাধ্যমে কেবলি মনের চোখের সংখ্যা বাড়াতে ব্যস্ত, সেখানে বাঙালী হয়ে উঠছে আরব্য উপন্যাসের এক চোখা দৈত্য সম। অথচ মনের ভিতর আরো একটা ভুবন সৃষ্টি করে নিতে পারলে জাগতিক অনেক যন্ত্রণা এড়ানো যায়। এ ব্যাপারে লেখক বারট্রাণ্ড রাসেলের সঙ্গে একমত। এই মনোভুবন নির্মাণ করার একটাই উপায় বিভিন্ন বই পড়া বা দেশ ভ্রমণ করা। যেহেতু দেশ ভ্রমণ করা আর্থিক ও শারীরিক কারণে অনেক পক্ষেই সম্ভবপ হয় না তাই বোধ

হয় ওমর খৈয়াম তাঁর বৈহেশ্‌তের সরঞ্জাম—এর তালিকায় সর্বাগ্রে রেখেছিলেন তাঁর প্রিয় বইগুলি। বিভিন্ন ধর্মও (মুসলমান-হিন্দু বা খ্রীষ্টান) কলমের শক্তির কথা যুগে যুগে স্বকার করে এসেছে। সুতরাং বই না পড়লে মানুষ সর্বার্থেই ভ্রষ্ট হবে।

কিন্তু সাধারণ বাঙালী ক্রমেই ভ্রষ্ট হচ্ছে কারণ জীবনের সবদিকে সে টাকা খরচ করতে পারলেও বই কেনার ব্যাপারে সে নিদারুণ কৃপণ। পাঠক এ ব্যাপারে প্রকাশককে দায়ী করেন প্রকাশকেরা আরো সস্তা দামে বই প্রকাশ করেন না। উল্টোদিকে প্রকাশকের বক্তব্য যথেষ্ট পরিমাণে বই বিক্রী না হ'লে বই-এর দাম কমানো যায় না। ফলে এক অচ্ছেদ্য চক্রে পড়ে বাঙালীর বই কেনা বা বই পড়া আর হয়ে ওঠে না। এ চক্র ছিন্ন করতে হবে পাঠককেই। কারণ প্রকাশক দেউলে হওয়ার ভয়ে ঝুঁকি নেবেন না। কিন্তু কেউ কখনো দেউলে হয় নি বলেছেন আলী সাহেব। বরং প্রতি মাসের বাজেটে বাঙালী বই কেনার খাতে কিছু টাকা যদি বরাদ্দ করে, তবু বই বেশি বিক্রী হওয়ার সুবাদে একদিকে যেমন বই-এর দাম কমবে ; তেমনি অন্যদিকে বাঙালী মনোরাজ্যে আরো সমৃদ্ধ হবে। লেখক তাই বাঙালী পাঠককে বই-এর নেশায় চুর হতে বলেছেন।

নিজের বই-এর প্রসঙ্গো এবং অপরের গ্রন্থাগারের প্রসঙ্গো লেখক ব্যঙ্গো নিপুণ। তাই তিনি লিখেছেন "আমি একখানা বই produce করেছি কেউ কেনে না বলে আমি consumer, অর্থাৎ নিজেই মাঝে মাঝে কিনি।" আবার মার্ক টুয়েন এং অধিকাংশ লোকের ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার সম্পর্কে তাঁর অভিমত—এঁরা কিছু বই কেনে, আর কিছু বই বন্ধুদের কাছ থেকে ধার করেন কিন্তু ফেরৎ দেন না। এভাবেই তাঁদের লাইব্রেরীতে বই স্তূপীকৃত হয়।

লেখকের মতে ধনীর ধনার্জনের চেয়ে জ্ঞানীর জ্ঞানার্জন অনেক কঠিন কাজ। তাই লেখক ধনীর চেয়ে জ্ঞানীকেই বেশি উচ্চাসন দিয়েছেন। কারণ ধনীর মেহনতের ফল টাকা, যা ধনী অপেক্ষা কোনো জ্ঞানী অনেক ভালো পথে ও উত্তম পদ্ধতিতে খরচ করতে পারেন। কিন্তু জ্ঞানীর জ্ঞানচর্চার ফল পুস্তক, যা ধনীর কেনো কাজে লাগে না। তাই জ্ঞানার্জনের জন্য মানুষ অকাতরে ধন ব্যয় করতে পারে। আবার উল্টোরকমের মানুষের সংখ্যাও নেহাত কম নয়। যাঁরা ঘর সাজাবার জন্য বই কেনেন। বই-এর প্রকৃত সম্মান করতে জানে ফ্রান্স—এই মন্তব্য করেছেন লেখক। মানুষকে সম্মান জানাতে বা অপমান করতে ফরাসীরা বই-এর সাহায্য নিয়ে থাকেন। এই প্রসঙ্গো লেখক আঁদ্রে জিদের সম্পর্কে একটি মজাদার তথ্য সরবরাহ করেছেন। রাশিয়া থেকে ফিরে জিদ যখন রুশদের বিরুদ্ধে লিখেছিলেন তখন প্যারিসের স্তালিনীয়রা জিদকে নানাভাবে বিপর্যস্ত করেছিলেন। অথচ তখন জিদের লেখকবন্ধুরা জিদের পক্ষ নিয়ে কিছুই বলেন নি বা লেখেন নি। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে জিদ এঁদের শিক্ষা দিতে এঁদের স্বাক্ষর সহ যে সব বই জিদকে উপহার দিয়েছিলেন, কেবল সেগুলিকেই কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে নিলামে চড়িয়েছিলেন। অপমানিক লেখকরা দ্বিগুণ তিনগুণ দাম দিয়ে নিজেদের লোক পাঠিয়ে ঐসব বই কিনে নিয়েছিলেন ; যাতে ব্যাপারটি কম জানাজানি হয়।—এভাবেই ফরাসীরা বই দিয়ে মানুষকে অপদস্ত করতেন।

বই কেনা ও বই পড়ার ব্যাপারে বাঙালীকে চেতনাসমৃদ্ধ করে তুলতে আপ্রাণ প্রয়াস করেছেন এই রমরচনাকার। বই কেনার ব্যাপারে বাঙালীর অনীহা লক্ষ্য করে তিনি ব্যথিত হয়েছিলেন। অথচ বাঙালীর যে ক্রয়ক্ষমতা নেই তা লেখক মানতে নারাজ, কারণ ফুটবল বা সিনেমার টিকিট কিনতে তিনি বাঙালীকে কার্পণ্য করতে দেখেন নি। পূজা বা নববর্ষে বাঙালী নতুন জামাকাপড় কেনায় বেশ দরাজ, কিন্তু বইমেলায় গিয়ে আজো অনেকে একটা বইও না কিনে খাবারের স্টলে 'কিউ' দেন। বাঙালীর এই বই-অপ্রীতির কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে লেখক আরবোপন্যাসের একটি গল্পের কথা মজাচ্ছলে লিখেছেন। কোনো এক হেকিমের একটি প্রিয় বই রাজা হস্তগত করেছিলেন হেকিমকে খুন করে। রাজা বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে বইটি যখন পড়ছিলেন তখন বইটির জুড়ে যাওয়া পাতাগুলি উল্টাতে গিয়ে তাঁকে বারবার আঙুলে থুথু নিয়ে জোড়া পাতা ছাড়াতে হয়েছিল। প্রতিশোধপ্রবণ হেকিমের বইটির জুড়ে যাওয়া পাতায় পাতায় মাখিয়ে রেখেছিলেন মারাত্মক বিষ, যা রাজার অজান্তে তাঁর মুখে যাচ্ছিল। প্রতিহিংসার এমন অভিব পন্থাটির কথাও হেকিম বইটির শেষ পাতায় জানিয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু সেই নিদারুণ তথ্যাটি জানার সঙ্গো রাজা ঐ বিষের প্রভাবে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছিলেন। কৌতুকপ্রবণ আলীসাহেবের অনুমান—এই গল্পটি জেনে গিয়েই হয়তো বাঙালী আর বই কেনে না বা বই পড়ে না। বই পড়ে অকালে যমালয়ে যেতে ভীরু বাঙালী স্বভাবতই রাজী নয়—অন্তিম বাক্যের এই শ্লেষ আজো যদি বাঙালীকে বই মুখো করতে না পারে তবে বাঙালীর সত্যিই বড় দুর্দিন।

৪৬.৫ সারাংশ

সৈয়দ মুজতবা আলী বাংলা রম্যরচনার এক উল্লেখযোগ্য লেখক। তাঁর রচনায় হাসির উপাদানের পাশাপাশি ভ্রমণকাহিনী, রোমান্টিক এবং মনস্তাত্ত্বিক কাহিনী, গোয়েন্দাকাহিনী ছাড়াও ভাষা, ধর্ম, শিক্ষা বিষয়েও অনেক গুরুত্বপূর্ণ রচনাও পাওয়া যায়।

তাঁর "বই কেনা" প্রবন্ধটি বাঙালিদের বই কেনা ও বই পড়ায় উৎসাহ বাড়াবার জন্যই লেখা, কারণ বাঙালিরা আর সব দিকে টাকা খরচ করলেও বই কেনার জন্য টাকা খরচ করতে চায় না। বরং তারা প্রকাশকদের আরো কম টাকায় বই বিক্রী করার পরামর্শ দেয়। কিন্তু প্রকাশকরা তা করতে চায় না। তাই আলী সাহেবের পরামর্শ প্রতিমাসে যদি কিছু বই কেনা যায়, তাহলেও বাঙালিরা মনের দিক থেকে যেমন সমৃদ্ধ হবে, তেমনি বই বেশি বিক্রী হলে আস্তে আস্তে বই দামও কমে যাবে। তবে বাঙালির যে টাকা নেই তা নয়। এ প্রসঙ্গে লেখক আরব্য উপন্যাসের হেকিম ও রাজার গল্প বলেছেন। সেখানে রাজা হেকিমকে খুন করে তার প্রিয় বই হস্তগত করেছিলেন। কিন্তু হেকিম বইটির পাতায় পাতায় বিষ মাখিয়ে রেখেছিল। রাজা পাতা ওল্টাতে গিয়ে আঙুলে থুথু নিয়ে পাতা ওল্টাচ্ছিলেন। বইটির শেষ পাতায় এসে রাজা যখন এ তথ্য জানতে পারলেন, তখন তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন, তাই আলী সাহেবের ধারণা বাঙালিরা হয়তো এই গল্পটি জেনে গিয়েই আর বই কেনে না।

৪৬.৬ অনুশীলনী

ক. অতিসংক্ষিপ্ত উত্তর দিন।

১। মার্ক টুয়েনের কী দেখবার মত ছিল ?
২। 'আল্লামা বিল কলমি'—কথাটির অর্থ কী ?
৩। 'সেও তো ওঁর একখানা রয়েছে'—কে, কাকে বলেছেন ?
৪। 'লেখকদের মতে বাঙালীর বই কেনার প্রতি বৈরাগ্যের কারণ কী ?
৫। লেখক কী লিখবেন বলে কলম ধরেছিলেন ?

খ. প্রসঙ্গ উল্লেখপূর্ব সংক্ষিপ্তভাবে তাৎপর্য লিখুন—

১। "যে যত বেশী ভুবন সৃষ্টি করতে পারে, যন্ত্রণা এড়াবার ক্ষমতা তার ততই বেশী হয়।"
২। "তাই এই অচ্ছেদ্য চক্র।"
৩। "কিন্তু লাইব্রেরীটা যে কায়দায় গড়ে তুলেছি, শেলফ তো আর সে কায়দায় জোগাড় করতে পারি নে।"

গ. ১। 'বই কেনা' নিবন্ধের মূল তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে সৈয়দ মুজতবা আলীর অভিনব দৃষ্টিভঙ্গী ও মজাদার রচনাভঙ্গির বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট করুন।
২। এই নিবন্ধে বাঙালিকে বই কেনায় অভ্যস্ত করে তুলতে প্রয়াসী আলী সাহেব নানা মজার ঘটনার উল্লেখ করেছেন।
৩। রম্য-রচনা হিসেবে 'বই কেনা'-র সার্থকতা বিচার করুন।

৪৬.৭ গ্রন্থপঞ্জী

১) শশিভূষণ দাশগুপ্ত—বাংলা সাহিত্যের একদিক।
২) সুনীল বন্দোপাধ্যায়—বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের ভূমিকা।
৩) সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী।